কায়েস আহমেদের *অন্ধ তীরন্দাজ* : বিচ্ছিন্নতাবোধের রূপায়ণ

মোহাম্মদ সাকিবুল হাসান*

[সারসংক্ষেপ : কায়েস আহমেদের (১৯৪৮-১৯৯২) গল্পে মানবমনের অন্তর্গূঢ় রহস্যের উন্মোচন ঘটেছে অবলীলায়। মানব মনের ব্যাখাতীত রহস্যকে প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গে বের করে আনার একটা দুর্মর আকাঙ্ক্ষা লক্ষ করা যায় তাঁর *অন্ধ তীরন্দাজ* (১৯৭৮) গল্পগ্রন্থে। তিনি বিরূপ সময়ের ফাঁদে আটকে পড়া এবং গন্তব্য খুঁজে না পাওয়া মানুষের অন্তর্বেদনার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন পরম মমতায়। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোর মধ্যে একদিকে যেমন লক্ষ করা যায় বিচ্ছিন্নতার সুতীব্র আর্তি ও হাহাকার, অন্যদিকে সমাজ-পরিপার্শ্বের সঙ্গে মেলবন্ধনের আকুল আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সমকালীন রাজনৈতিক সংকট, সামাজিক অসংগতি-অসমতা, আত্মমগ্ন-চেতনা, শিকড়-উন্মূলিত মনোভাব, সমাজ-বিচ্ছিন্ন নৈঃসঙ্গ্যবোধ, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, একাকিত্বের যন্ত্রণা কায়েস আহমেদের গল্প-সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে করেছে দ্বিধাগ্রস্ত ও বিদীর্ণ। ফলে বিচ্ছিন্নতাই হয়ে ওঠে তাদের জীবনের অনিবার্য নিয়তি। *বক্ষ্যমাণ* প্রবন্ধে আমরা কায়েস আহমেদের *অন্ধ তীরন্দাজ* গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলোতে বিচ্ছিন্নতাবোধের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে, তার স্বরূপ-বৈচিত্র্য ও কার্যকারণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হব।]

সংকেত শব্দ : আত্মমগ্ন-চেতনা, শিল্পী স্বাতন্ত্র্য, বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিঃসঙ্গতা।

দেশ-বিভাগোত্তর বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ধারায় স্বাতন্ত্র্য-অন্বেষী জীবনবোধ ও নিরীক্ষাপ্রবণ শিল্পবৈশিষ্ট্য নিয়ে কায়েস আহমেদের দীপ্র আবির্ভাব। বাংলা সাহিত্যের স্বল্পপ্রজ লেখকদের মধ্যে কায়েস আহমেদ অন্যতম যিনি তাঁর নিরীক্ষাপ্রবণ লেখনী এবং জীবন সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধিৎসু ভাবনা প্রকাশ্যের মধ্য দিয়ে একটি স্থায়ী আসন দখল করে নিয়েছেন। বাংলাদেশের ষাটের দশকের ছোটগল্পের ধারায় বিষয় নির্বাচন ও রচনাশৈলীতে কায়েস আহমেদের নিজস্বতা ও মৌলিকত্ব বিশিষ্টতার দাবিদার। জীবন সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধিৎসা, সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে আত্মগত পরিচয় কায়েস আহমেদের শিল্পিসত্তাকে করেছে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। কায়েস আহমেদের জীবনকে দেখার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> কায়েস আহমেদ সবসময় ছিলেন নতুন লেখক। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি লিখে গেছেন নতুন লেখকের প্রেরণা ও কষ্ট এবং নতুন লেখকের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন নিয়ে। যা দেখতেন তা-ই তাঁর কাছে নতুন। চারপাশের সবকিছুই তাঁর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা চাই। তাঁর দেখা তো স্রেফ অবলোকন নয়, এই দেখার প্রতিশব্দ হল পর্যবেক্ষণ। তাও হল না, অভিধান যা-ই বলুক, তাঁর দেখা মানে অনুসন্ধান। (আখতারুজ্জামান, ২০২০ : ১৩০)

জীবন সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না। আপন মেধা ও মনন দিয়ে গভীর অনুসন্ধানী চোখ মেলে তিনি মানুষের ভেতরটাকে বের করে আনতে চেয়েছেন তাঁর শিল্পকর্মে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর কায়েস আহমেদ পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার বড়তাজপুর গ্রাম থেকে

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।

সপরিবারে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৬৪ সালে কে. এল. জুবিলি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৬৬ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হন। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাড়ায় প্রত্যাশিত ভালো ফল করা সত্ত্বেও বছর যেতে না যেতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ ছেড়ে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনায় ইতি টেনে তিনি 'দৈনিক গণকণ্ঠে' সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। 'দৈনিক সংবাদে'ও কিছুদিন কাজ করেন তিনি। কিন্তু আপসহীন মনোভঙ্গির কারণে তাঁর পক্ষে সাংবাদিকতার কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ১৯৭৫ সালে কায়েস আহমেদ গেন্ডারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে তাঁর প্রিয় পেশা শিক্ষকতায় যোগদান করেন। ১৯৮০ সালে ঢাকার 'উইলস লিটল ফ্লাওয়ার' স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে যেচে চাকরি দেয়। নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক হিসেবে তিনি শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছিলেন, কিন্তু ডিগ্রির অভাবে যেকোনো সময় চাকুরিচ্যুত হওয়ার ভয় থাকলেও তিনি ডিগ্রি পরীক্ষা দেননি। ১৯৬৯ সালে হুগলিতে কায়েস আহমেদের পিতা মৃত্যুবরণ করলে শেষবারের মতো তাঁকে দেখার জন্য অনেক চেষ্টা করেও বাড়ি যেতে পারেননি। কারণ পাসপোর্ট করতে গিয়ে দেখেন, তিনি যে পাকিস্তানের নাগরিক সেই প্রমাণ তাঁর হাতে নেই। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সেই সময় তিনি মায়ের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়েছেন। যুদ্ধশেষে তিনি আবার ঢাকায় ফিরে আসেন, আর কোনোদিন নিজের গ্রামে ফিরে যাননি। মা, মাতৃভূমি ও স্বজনদের প্রতি গভীর ভালোবাসা সত্ত্বেও দেশ স্বাধীন হবার পর হুগলী থেকে ঢাকায় চলে আসা তাঁর সাহিত্যভাবনায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে। কারণ সদ্য স্বাধীন দেশের আত্মিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট, বাস্তুহারা মানুষের জীবন যন্ত্রণা, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প, লাঞ্ছিত মানবতার হাহাকার কায়েস আহমেদের শিল্পীসত্তাকে করেছিল বিষাদক্লিষ্ট। অপরিচিত ও স্বজনহীন পরিবেশ এবং বিরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা তাঁর লেখকসত্তার জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কায়েস আহমেদের মনস্তত্ত্বে ঢাকার জীবনের প্রভাব সম্পর্কে একজন সমালোচক লিখেছেন : "মুক্তিযুদ্ধের সময় পশ্চিমবঙ্গে মাতৃভূমিতে যেতে হলেও স্বাধীনতার পর কোনো এক দুর্দমনীয় টানে আবার মায়ের কোল ছেড়ে ফিরে আসেন তাঁর প্রিয় ঢাকায়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরেও দেখেন মানুষের মধ্যে হতাশা, অনাহার, খুন-রাহাজানি, লুটতরাজ অর্থাৎ স্বাধীন দেশে মানবতার চরম অবমাননা। সময়ের এই চাপ ও তাপ কায়েস আহমেদের মানস গঠনে গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল" (অনিরুদ্ধ, ২০১৮ : ৩৮৪)। তাছাড়া দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত স্ত্রীকে প্রায় দশ বছর ধরে সেবা, প্রেম ও ভালোবাসা দিয়ে সারিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। জীবনের এই দুর্বহ যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার মধ্যেও কায়েস আহমেদ জীবনের নবতর অর্থের সন্ধান করেছেন। অর্থ কষ্ট থাকলেও তিনি কখনো কারো কাছে করুণা ভিক্ষা করেননি। যদিও হুগলির বড়তাজপুর গ্রামের বিখ্যাত শেখ পরিবারে তাঁর জন্ম এবং আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলেও তাঁদের কারো সঙ্গেই তিনি যোগাযোগ রাখতেন না। অনিশ্চিত জীবনকেই তিনি অধিক ভালোবাসতেন। নিশ্চিত সুখী-স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের জন্য যে আপসকামী মনোভাব দরকার তা তাঁর ধাতে ছিল না, কিংবা বলা যায় স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন তিনি পছন্দ করতেন না। কায়েস আহমেদ মানুষের বাইরের রূপের চেয়ে তার ভেতরের রহস্যময় জগতে সন্ধানী আলো ফেলে জীবনরহস্য উন্মোচনে আগ্রহী ছিলেন বেশি। তাঁর এই জীবন অনুসন্ধান-স্পৃহা স্বেচ্ছামৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রবল ছিল। স্বেচ্ছামৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি যেন জীবনের রহস্যময়তার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহকেই জারি রেখে গেছেন, যে রহস্যসময়তার অনুসন্ধানে পাঠক তাঁর সহযাত্রী হয়ে যায়। কেননা—"লেখকের অন্তর্গত জিজ্ঞাসা ও জীবন সমীক্ষণের নিজস্ব প্রকৃতিই বস্তুত হয়ে ওঠে তাঁর শৈল্পিক অভিপ্রায় ও শিল্পদৃষ্টির মৌল প্রেরণা" (চঞ্চল, ২০০৯ : ৩১৩)। জীবনকে দেখা ও দেখানোর ক্ষেত্রে

কায়েস আহমেদের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। লেখক জীবনের শুরু থেকেই তিনি প্রকরণ-পরিচর্যায় পরীক্ষাপ্রবণ এবং বিষয়-ভাবনায় বৈচিত্র্যসন্ধানী। কায়েস আহমেদ অর্থ, বিত্ত, খ্যাতি লাভের জন্য লিখতেন না; বরং জীবনের দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশা, ঘৃণা, ক্রোধ, স্বপ্ন, বিশ্বাস, ভালোবাসা, অপমান, লাঞ্ছনাকে লেখায় ধারণ করে বাঁচার রসদ খুঁজেছেন। কায়েস আহমেদ অতিপ্রজ লেখক ছিলেন না, তাঁর লেখার পরিমাণ বিপুল না হবার কারণ সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন—

> নিজের লেখার ব্যাপারে সবচেয়ে অসন্তুষ্ট আমি। লেখার চেয়ে লেখা নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় সময় কেটে যায় আমার সবচেয়ে বেশি। ফলে লেখার সংখ্যা বাড়ে না। লেখালেখি নিয়ে এতো বছর কেটে গেলো, কিন্তু লিখতে বসলেই মনে হয় এই প্রথম কলম ধরছি, দারুণ চ্যালেঞ্জ বোধ করি—যেন রিংয়ের ভেতরে ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের সামনে ম্যাটাডোর। যে কোন সময় ওই তীক্ষ্ণ শিংয়ে আমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।
>
> নিজেকে এত যে দুমড়ে মুচড়ে নিংড়ে শেষ করে লেখাটা লিখলাম সেই লেখাই যখন ছাপার হরফে দেখি তখন নিজের অক্ষমতার জন্যে নিজের ওপরেই রাগ ধরে। কোথায়? যেমন করে কথাগুলো বলতে চেয়েছিলাম তা বলা হলো কোথায়? এই হলো আমার লেখালেখির অন্দরমহলের খবর। না, নিজের লেখা নিয়ে আমি স্থির নিশ্চিত হতে পারিনি এখনও। সারা জীবনেও কি পারবো? (কায়েস, ২০১৪ : ২০১)

কায়েস আহমেদ জীবনের ক্ষেত্রে যেমন আপসহীন ছিলেন, তেমনি লেখালেখির ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সংযমী ও খুঁতখুঁতে স্বভাবের ছিলেন। তিনি ভাবতেন বেশি, লিখতেন কম। এই যে লেখা নিয়ে কায়েস আহমেদের স্থির নিশ্চিত না হতে পারার বেদনা ছিল জীবনভর, সেই নিশ্চয়তা পাবার জন্যই কি তিনি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন? এই জিজ্ঞাসা-প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েই যেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর স্বেচ্ছামৃত্যুর কার্যকারণ-সূত্র তুলে ধরেন এভাবে :

> মানুষের জীবনের রহস্য খুঁজতে খুঁজতে নিজের জীবনভর অনুসন্ধানের চরম জবাবটি পাওয়ার জন্যই কি মরিবার হল তাঁর সাধ? মানুষের রহমস্যময়তা ভেদ করতে না-পেরে, তিনি কি পরম জিজ্ঞাসাটি ছুড়ে দিলেন প্রকৃতির দিকে? কায়েসের কোনো সাধ আর সাধ থাকে না, তাঁর সব সাধই রূপ নেয় সংকল্পে। তাঁর সংকল্প আর জিজ্ঞাসা পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য। কায়েস আহমেদের আত্মহত্যা কি তাঁর অনন্ত জিজ্ঞাসা অব্যাহত রাখার শেষ সংকল্প? (আখতারুজ্জামান, ২০২০ : ১৩২)

কায়েস আহমেদের জীবৎকালে মাত্র চারটি বই প্রকাশ পায়; যার দুটি গল্পগ্রন্থ : *অন্ধ তীরন্দাজ* (১৯৭৮) ও *লাশকাটা ঘর* (১৯৮৭) এবং দুটি উপন্যাস : *নির্বাসিত একজন* (১৯৮৭) ও *দিনযাপন* (১৯৮৬)। এছাড়া কিছু অগ্রন্থিত সাক্ষাৎকার, কবিতা ও প্রবন্ধ নিয়ে কায়েস আহমেদের সাহিত্যের ব্যাপ্তি। অতি সাম্প্রতিককালে কায়েস আহমেদের *কতিপয় মৃত স্বপ্নের চোখ* নামে একটি উপন্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে যা এখনও অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত। এই স্বল্পপুঁজির সৃষ্টিসম্ভার নিয়েই বাংলা সাহিত্যে কায়েস আহমেদের সদর্প বিচরণ। পরিমাণে স্বল্প হলেও কায়েস আহমেদের রচনাসমগ্র বাংলা সাহিত্যের এক অতুলনীয় সম্পদ, কেননা আমাদের যাপিত জীবনার্থের সঙ্গে তাঁর রচনা গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর কথাসাহিত্যে গভীর সংবেদনশীলতায় মানবজীবনের অন্তর্লোক ও বহির্লোকের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে কায়েস আহমেদের রচনাবলির প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কথাসাহিত্যিক শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮) লিখেছেন :

> [...] কায়েস আহমেদের রচনার সম্পূর্ণটাই জীবনের কথা। যদি প্রশ্ন করা হয় কোন্ জীবন, তাহলে তার সুস্পষ্ট ও সজোর জবাব হলো, যে জীবন এদেশের অধিকাংশ মানুষ যাপন করে, যে

> জীবনযাপনের প্রক্রিয়ায় মানুষ অনবরত মার খায়। শোষিত হয়, লাঞ্ছিত হয় এবং মাথা নিচু করতে করতে প্রায় মাটিতে নাকমুখ ঘষটাতে ঘষটাতে নিজ অস্তিত্বের পরিচয়টাকে পর্যন্ত লুপ্ত করে দেয়। ঐ মার খাওয়া এবং ক্রমাগত ন্যুব্জ হতে থাকা জীবনের চেহারাটিকে কায়েস ভালোমানুষী আর ভদ্দরলোকী আবরণটিকে ছিঁড়ে ফেঁড়ে দেখিয়ে দেন। অনিবার্যভাবে ক্ষয়ে যাওয়া মধ্যবিত্তের শ্রমজীবী স্তরে নেমে যাওয়ার কষ্ট, বেদনা ও গুমরানো হাহাকারকে তিনি খুব স্পষ্ট ভাষায় পরিষ্কারভাবে আমাদের শুনিয়ে দেন। (শওকত, ১৯৯৪ : ২১-২২)

কায়েস আহমেদের *অন্ধ তীরন্দাজ* গল্পগ্রন্থে দুঃসহ সময়ের বৃত্তে বন্দি নিঃস্ব, অসহায়, নিঃসঙ্গ, বিপন্ন, ক্লান্ত, দুঃস্বপ্নতাড়িত ভাঙাচোরা মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। মানবহৃদয়ে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার (Loneliness) সৃষ্টি হয় বিচ্ছিন্নতাবোধ (Alienation) থেকে। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই বিচ্ছিন্নতাবোধ মানুষের অগ্রযাত্রার অনুগামী হয়েছে। সভ্যতার অগ্রসৃয়মানতার সাথে সাথে মানুষ যতই সংঘবদ্ধ হয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের, সমাজের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করেছে; ততই ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার কারণে মানুষের অন্তর্লোকে বিচ্ছিন্নতার দেয়ালও তৈরি হয়েছে। এ হিসেবে বিচ্ছিন্নতাবোধের ইতিহাস মানবসভ্যতার ইতিহাসের মতোই পুরনো। কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) বিচ্ছিন্নতাবোধকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : "ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা থেকেই বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব হয় এবং এই বিচ্ছিন্নতাই মানুষকে নিক্ষেপ করে নৈঃসঙ্গ্যের অতল গহ্বরে" (বিশ্বজিৎ, ১৯৯৭ : ২১)। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অস্থিরতা, অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মানবিক সম্পর্ক থেকে বিযুক্তি ও বিচ্যুতি আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রধান কারণ। এইসব বিচ্ছিন্নতাবোধ আধুনিক মানুষের চিত্তলোকে সঞ্চার করেছে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠ, চিত্তবৈকল্য ও আন্তঃমানবিক সম্পর্কহীনতা। সঙ্গত কারণেই এইসব আত্মখণ্ডিত আধুনিক মানুষেরা জীবনের সুর ও সঙ্গতি থেকে বিচ্যুত হয়ে নৈঃসঙ্গ্যের অতল গহ্বরে নিপতিত হচ্ছে। ব্যক্তির অস্তিত্বের সঙ্কটের মূলে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ-সৃষ্ট সর্বগ্রাসী বিচ্ছিন্নতাবোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কায়েস আহমেদের *অন্ধ তীরন্দাজ* (১৯৭৮) গল্পগ্রন্থে শিল্পিত হয়েছে সময়ের চাকায় পিষ্ট নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত আধুনিক বিপন্ন মানুষের অন্তর্বেদনার কথা। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত স্মরণীয় : "কায়েস আহমেদের ছোটগল্পের মানুষগুলো অধিকাংশ সময় আত্মগত ভাবের দ্বারা তাড়িত" (আজহার, ২০১৪ : ৫৪৭)। তাঁর গল্পের চরিত্ররা কেবল দুর্ভর যন্ত্রণা সহ্য করে যায়, সময়কে জয় করার সাধ্য ও সঙ্গতি যেন তাদের নেই। বিরুদ্ধ সময়কে জয় করার সাহস দেখায় না তারা। বিরূপ সময়ের কাঁধে চড়েই তারা মুক্ত হতে চায়। অবশ্য অনেক সময় তারা চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়, সেখানে সময়ই যেন তাদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। *অন্ধ তীরন্দাজ* গল্পগ্রন্থ সম্পর্কে হায়াৎ মামুদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "তিনি গল্পের শরীরে এ দেশের ইতিহাস ও সময় এবং সময়েতিহাস শাসিত মানুষকে ধরতে চেয়েছেন। ইতিহাস ও সময়ই সেই তীরন্দাজ, বারংবার শিকার করে এদেশের মানুষ : আপনাকে আমাকে সকলকে। সে অন্ধ তো বটেই, ক্ষমাহীন নির্দয়ও" (হায়াৎ, ১৯৯৪ : ২৫)।

অন্ধ তীরন্দাজ গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'অন্তর্লীন চখাচখী'তে বিশ-বাইশ বছর বয়সী যুবক পল্টুর দোলাকে না পাওয়ার ব্যর্থতা এবং সেই ব্যর্থতাজনিত বেদনাবোধ থেকে আত্মবিচ্ছিন্নতা কীভাবে তাকে দুর্ভর যন্ত্রণা ও নৈঃসঙ্গ্যের অভিশাপে বিপর্যস্ত ও বিনষ্ট করে তারই চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। দোলার সাথে নায়ক পল্টুর দেখা হয় অক্টোবর মাসের এক দুপুরে। তখন দোলা খয়েরি রঙের শাড়ি পরিধান করে এসেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত মিলনের মুহূর্তটি আসার আগেই দোলা চলে যায় এবং জ্যোৎস্নালোকিত রাতে পল্টুর কথা ভেবে বালিশের ওপর মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। অন্যদিকে পল্টুও খুব সহজেই তাকে আবার আসার কথা বলে বিদায়

জানিয়ে দিলেও তার চলে যাবার পর বইয়ের পাতা খুলে পড়তে চাইলেও মনোযোগ চলে যায় সেই মেয়েটির দিকে। মেয়েটির প্রস্থানের পর পল্টুর ভেতরে হাল্কা শীত ও তৃষ্ণার অনুভব সঞ্চারের মধ্য দিয়ে লেখক সুপ্ত যৌন-বাসনার কথাই ব্যক্ত করেছেন। অস্ট্রিয়ান মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) আধুনিক মানুষের বহুমাত্রিক বিচ্ছিন্নতার অন্যতম কারণ হিসেবে লিবিডো বা অবচেতন যৌন আকাঙ্ক্ষার সর্বগ্রাসী প্রভাবকে দায়ী করেছেন। মানুষের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার তীব্র অবদমন অনেক সময় তার মানসিক উৎকণ্ঠা, ভয়, বিপন্নতা ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিরূপ সমাজ পরিপার্শ্বের কারণে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে মানবমনে উদ্বেগ জন্ম নেয়। অতিরিক্ত উদ্বেগ ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অস্তিত্ব-ভীতির সঞ্চার করে; যা তাকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন করে দেয় ব্যক্তি, সমাজ, প্রকৃতি ও পরিপার্শ্ব থেকে। তীব্র উদ্বেগের অসহনীয় চাপে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্যচ্যুতি ও পলায়নপরতার মতো ঘটনা ঘটতে পারে। এমনকি দুর্ভর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের আশায় বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি আত্মহননের পথও বেছে নিতে পারে। দোলার সাহচর্য বঞ্চিত হয়ে পল্টুরও মৃত্যুর কথা মনে আসে :

> গতকাল রাতে জ্যোৎস্না ছিলো, অনেকক্ষণ ধরে সেই জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে একটা মালগাড়ি যাচ্ছিলো ককিয়ে ককিয়ে। দক্ষিণ জলার ফসলভরা মাঠ, গোরস্তান, ঝিম ধরে থাকা শিশির ভেজা বাগান পেরিয়ে সেই শব্দ আসছিলো, সেই নিথর-নিবিড় নির্জনতার ভেতর মালগাড়ী যাওয়ার একঘেঁয়ে ক্লান্ত শব্দটা শুনতে শুনতে তার মৃত্যুর কথা মনে আসে। আর তখন অদ্ভুত এক বিষণ্নতার মধ্যে মুখ, চোখ, মাথাভর্তি পিঠ এলোনো কালো একরাশ চুল, খয়েরী রঙের শাড়িপরা সর্ব-অবয়ব নিয়ে মেয়েটির ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। (কায়েস, ২০১৪ : ২২)

দীর্ঘ সাত বছর পর খালার বাড়ি বেড়াতে এসে সারা সময় পল্টু শুয়ে-বসেই কাটিয়ে দেয়। তার পর খালাতো বোন রিনির ডাকে সে বিকেলবেলা বাইরে ঘুরতে যায়। সবুজ ধান ক্ষেত, জলা, রেললাইন আর সূর্যের শেষ আলো গায়ে মেখে সারি সারি বকেদের বাড়ি ফেরা দেখতে দেখতে যখন সে উল্টে পড়া খেজুর গাছের পাশে বসে, তখন ট্রেনের হুইসেল শুনতে পেয়ে তার মনে হয় অবিকল মানুষের মতো নাম ধরে কেউ যেন তাকে ডাকছে। সন্ধ্যা নামলেও পল্টু সেখান থেকে উঠে না। চারদিকে ডানা মেলা শকুনের মতো ঝপ ঝপ করে অন্ধকার নামলেও সে ট্রেনের অপেক্ষায় বসে থেকে অন্ধকার উপভোগ করে। তার শৈশবের ট্রেন দেখার স্মৃতি যেমন ভয়ের তেমনি কৌতূহলের। কায়েস আহমেদের গল্প-উপন্যাসে ট্রেনের প্রসঙ্গটি বারবার এসেছে। মানুষের জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব ও গতিময়তার দিকটি বোঝাতে কায়েস আহমেদ এই প্রতীকের ব্যবহার করেছেন। কায়েস আহমেদের গল্প-উপন্যাসে সর্বাধিক ব্যবহৃত এই প্রতীক প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> ট্রেন কি গতিময়তার অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে, নাকি তার অস্থায়িত্বের জন্যে? অথবা আমরা কি বলতে পারি যে, ট্রেনলাইন আর তার চারপাশের জনপদে যাই ঘটুক, ট্রেন চলছে। মানুষের জীবন এই রকমই বহমান। সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা অসংখ্য কিছু প্রবহমান জীবনের কারো উপস্থিতি অনুপস্থিতিই বিষয় নয়। জীবনের এ বহমানতার মধ্যে এক ধরনের রূঢ় বাস্তবতা আছে, আছে এক ধরনের বেদনা। (আলী, ২০১২ : ৪৪১)

বিচ্ছিন্ন মানুষ কোথাও নিজেকে সংযুক্ত করতে না পেরে অনেক সময় শৈশবের কোনো ঘটনায় ফিরে গিয়ে হতাশা ও বিপন্নতাকে জয় করতে চায়। 'অন্তর্লীন চখাচখী' গল্পের নায়ক পল্টুকেও আমরা দেখি অন্ধকার নির্জন মাঠে নিঃসঙ্গ অবস্থায় শৈশবের স্মৃতিচারণ করে কৌতূহল অনুভব করতে। সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে ঝক ঝক শব্দে কখন ট্রেন আসবে কিন্তু তার পরিবর্তে কয়েক হাত দূরে সে দেখতে পায় লম্বা একটা সাপ আলের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে ধান ক্ষেতের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে। তখন সাপটি চলে যাওয়ার ফলে তার চারপাশে থাকা ধান

গাছের সরসর শব্দ এবং নির্জন অন্ধকার পল্টুর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। ভয়ে সে সামনের দিকে তাকিয়ে পেছনের দিকে হাঁটতে থাকে। তার ভেতরের বিচ্ছিন্নতা তাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলে। সাপের ভয়ে সে সামনের দিকে তাকিয়ে দৌড়াতে পর্যন্ত ভয় পায়। সাপের কামড় থেকে বাঁচবার জন্য সে ক্রমাগত ছুটে চলে। অবশেষে বাড়ি ফিরে আসে কিন্তু রাতে তার ঘুম হয় না। তার কেবলই মনে হয় সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে দেয়ালের ফাঁক-ফোকরে লুকিয়ে আছে। মশারীর কোথাও কোনো ফাঁক আছে কিনা তাও সে পরীক্ষা করে দেখে এবং মশারীর চারপাশ ভালোভাবে গুঁজে দেয়, যেন কোনোভাবেই সাপ ঢুকতে না পারে। এভাবেই তার "বুকের ভেতরে আতঙ্ক চরে বেড়ায় এবং অসহায় সে একা শুয়ে থাকে। ঘুম আসে না" (কায়েস, ২০১৪ : ২৪)। বিছানায় শুয়ে পল্টু দোলার কথা, ট্রেনের কথা, ট্রেনের হুইসেলের মাধ্যমে তাকে নাম ধরে ডাকা এবং ডাকের উত্তর দেবার পর প্রত্যুত্তর না আসা, শেষ পর্যন্ত ট্রেন না আসা; সর্বোপরি সাপের চিন্তা তাকে ক্লান্ত করে ফেলে। ক্লান্তির অতলতায় ডুবে যাওয়া পল্টু একটা পোড়ো বাড়ির বকুল গাছের নিচে যখন একা বসে থাকে তখন সে দেখতে পায় দোলা ধানক্ষেত মাড়িয়ে উর্ধ্বশ্বাসে তার দিকে ছুটে আসছে। তখনই তার ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পল্টুর নিঃসঙ্গ একাকী বিচ্ছিন্ন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে সাপের আঘাতেই। সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন :

> [...] পল্টু সেই আনারস আর বাসক বনের পাশে দাঁড়িয়ে রের লাইনের দিকে তাকিয়ে থাকে, [...] আর তখন হিস-স শব্দ হয় এবং পায়ের ওপর হাওয়া এবং চিড়িক করে ওঠা জ্বালা অনুভব করলে সে চোখ ফিরিয়েই দেখতে পায় শরীরের অর্ধাংশ তুলে বিশাল ফণা নিয়ে দুলছে তার সামনে, মুখের ভেতর থেকে সরু সুতোর মতো জিভ খুব দ্রুত আসা যাওয়া করছে, দুর্বোধ্য উল্কিকাটা ম্যাটমেটে শরীরের ওপর সূর্যের আলোয় অপূর্ব বিভা চমকাচ্ছে, পল্টু নড়তে পারলো না, নিজের পায়ের দিকে তাকাতে পারলো না, তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে কেবল আল্পনা আঁকা কুলোর মতো বিশাল ফণা [...] (কায়েস, ২০১৪ : ২৭)

শেষ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষের ভিড় ও কান্না ঠেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে পল্টু। কিন্তু মৃত্যুর আগেও দোলার তরঙ্গায়িত সম্বোধন ধ্বনির প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে থমকে যায় সে আর দেখে তার সামনে খয়েরি রঙের শাড়ি পরিহিত শ্যামলা মুখ আর পাতলা ঠোঁট নিয়ে থির থির করে কাঁপছে দোলা।

'যাত্রা' গল্পের নামহীন নায়ক গাড়ি থেকে ভুল স্টেশনে নেমে দেখতে পায় সমস্ত প্ল্যাটফরম ফাঁকা পড়ে আছে। নভেম্বর মাসের অন্ধকার শীতের রাতে চারপাশে মানুষ খুঁজতে গিয়ে কারো দেখা পায় না সে। স্টেশনে যাত্রী থাকা তো দূরে থাক এমনকি পয়েন্টসম্যান, টিকিট চেকার ও স্টেশন মাস্টার পর্যন্ত নেই। হঠাৎ সে দেখতে পায় চাদর মুড়ি দেয়া একজন মানুষ হনহন করে সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। অপরিচিত জায়গায় অন্ধকারের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকা নায়ক চাদর মুড়ি দিয়ে হাঁটতে থাকা লোকটিকে পেছন থেকে অনুসরণ করে। লোকটিকে ডাকতে গিয়ে দেখা গেলো সে ডাক তার ভেতরেই মিলিয়ে গেছে। কিন্তু লোকটি যতই হেঁটে নায়কের আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে ততই তার মধ্যে ভয়, বিপন্নতা আর অস্থিরতা কাজ করতে থাকে। নায়ক এই ভয় ও বিপন্নতা থেকে মুক্ত হতে চায়। মানুষ নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতার অন্ধকার কুয়াশা থেকে নিজেকে মুক্ত করে বৃহত্তর জনমানসের সঙ্গে সংলগ্ন করতে চায়। মানব-সংস্পর্শ রহিত বিচ্ছিন্নতাজাত নিঃসঙ্গতার ফলে নায়কের অস্তিত্ব বিপন্নতার অতলে ডুবে যেতে থাকে। নৈঃসঙ্গ্য থেকে মুক্তি লাভের আশায় চাদর জড়ানো লোকটাকে সে গভীরভাবে প্রত্যাশা করে। কিন্তু তার সেই প্রত্যাশা গহীন অন্ধকার ও নির্জন চরাচরে কারো মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। নায়কের অন্তর্লোকের আর্তি বহির্লোকে প্রতিধ্বনিত হয়ে খান খান হয়ে যায়।

তার মর্মবেদনার কথা কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। গল্পকার তার ভেতরের সেই বিপন্নতার দৃশ্যচিত্র উপস্থাপন করেছেন এভাবে :

> সেই শব্দ দুললো, অন্ধকারে, ঠাণ্ডা কুয়াশা মাখা বাতাসে মিশলো, তারপর তার বুকের ভেতরে ঢুকে গিয়ে গুরগুর করে উঠতে থাকলো। কেননা সেই শব্দের ভেতর ভয়, বিপন্নতা এবং ভালোবাসা। কেননা তখন তার মা ছোট যে ভাইটা মাটি এবং ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিয়েছে, পরিচিত মানুষজন, শৈশব, কৈশোর, দৃশ্যমান এবং কল্পনার বিশাল ভূমণ্ডলের সমস্ত কিছু জেগে উঠছিলো। মনে পড়ছিলো হায়নার মতো ধেয়ে আসা সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্যত সঙ্গীন থেকে নদী সাঁতরে এক গ্রাম্য মসজিদে ঢুকে প্রতি পদে অনুভব করেছিলো বেঁচে থাকা তার কাছে কী বিপুলভাবে কাম্য। (কায়েস, ২০১৪ : ২৮)

লোকটিকে নায়ক পেছন থেকে কয়েকবার ডাকে, কিন্তু সেই ডাক অন্ধকারের নীরবতা ভাঙা ছাড়া আর কোনো কাজে আসে না। আবার সে মরিয়া হয়ে লোকটিকে ডাকে এবং লোকটি ডাক শুনতে পেরে নায়ক জোরে পা চালিয়ে লোকটির কাছাকাছি গিয়ে তার মুখ দেখার চেষ্টা করে। চাদরে ঢাকা লোকটিকে শনাক্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় নায়ক। কারণ একদিকে লোকটির মাথা চাদরে ঢাকা, অন্যদিকে অন্ধকারে সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। অন্যন্যোপায় হয়ে লোকটির কাছে সে যখন তার গন্তব্য সম্পর্কে জানতে চায় তখন সেই অপরিচিত নির্বিকার: "লোকটি কোন উত্তর না দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে সামনের কুয়াশায় ঢাকা অন্ধকার শূন্যতার প্রতি নির্দেশ করে।" (কায়েস, ২০১৪ : ২৯)

অন্ধকারের দিকে যাত্রা করা লোকটির কথা ভেবে সে আরো বেশি বিপন্ন ও অসহায় বোধ করে। অবশেষে নিরুপায় হয়ে সে লোকটিকে অনুসরণ করতে থাকে আর কোন স্টেশনে তারা নামতে চেয়েছিল সেটি মনে করবার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই সে সেই স্টেশনের নাম স্মরণ করতে পারে না। স্টেশনের নাম মনে করতে না পারার বেদনায় এই নভেম্বরের শীতের রাতেও তার কপাল, চোয়াল, হাতের তালু, বুকের কিয়দংশ আর বগল ঘামে ভিজে যায়। তদুপরি রেল লাইনের পাশ দিয়ে বয়ে চলা ধূসর, ধূলিময় পথ আর নুড়ি পাথরের ওপর হোঁচট খেয়ে খেয়ে সেই লোকটির পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকে সে। এক পর্যায়ে দেখতে পায়, যে পথ দিয়ে তারা হাঁটছে তার নিচেই একটি খাদ। অচেনা লোকটি অন্ধকারের ভেতর খাদের দিকে নামতে থাকলে, তাকে অনুসরণ করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না। যখন খাদের কিনারে এসে সেই অপরিচিত রহস্যময় লোকটি তাকে হাত বাড়িয়ে আহ্বান জানায়, তখনও তার মুখ দেখতে পায় না সে। কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে সে তার দিকে এগিয়ে গেলে লোকটি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েই একটা শিশুর মতো করে তাকে কাঁধে তুলে নেয়। নির্জন অন্ধকারের মধ্যে জল কেটে কেটে সেই অপরিচিত রহস্যময় লোকটি যত সামনে এগুতে থাকে ভয়ে তার মনে হতে থাকে:

> লোকটা এবার আমায় ডুবিয়ে মারবে এবং মনে হয় তাকে কাঁধে তুলে নেবার সময় সে যেনো চকিতে দেখতে পেয়েছিলো লোকটার কোনো চোখ নেই, নাক নেই, গোল গোল কয়েখটা ছোট বড় ছিদ্র এবং সর্বোপরি তার মুখে কোনো মাংস নেই। তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সমস্ত শরীর হিম হয়ে আসে। কিন্তু কোনো উপায় নেই, কেননা তার শক্তি ক্রমশঃ অবলুপ্ত হয়ে আসছে এবং তার ঝুলন্ত হাত দুটো লোকটার খসখসে শক্ত মুঠির ভেতর বন্দী। (কায়েস, ২০১৪ : ২৯)

অপরিচিত লোকটির মুঠির ভেতর বন্দি হয়ে সে ছটফট করতে থাকে আর কেবলই মনে হতে থাকে লোকটি তাকে খাদের মধ্যে পুঁতে রেখে চলে যাবে। অস্তিত্বের ভয়ে সে চিৎকার করতে চায় কিন্তু "লোকটা কোনো কথা না বলে সেই নির্জন চরাচরে জলের ওপর শব্দ তুলে তুলে

সামনের কুয়াশা ঢাকা বিশাল অন্ধকার শূন্যতার দিকে তাকে কাঁধে নিয়ে এগুতে থাকে" (কায়েস, ২০১৪ : ২৯)। পরিণতির কথা না ভেবে অন্ধকার শূন্যতার দিকে নায়কের এই অজানা যাত্রার সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিজীবনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই যাত্রা শেষ পর্যন্ত নায়ককে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছিল কিনা আমরা তা জানি না, কিন্তু দারিদ্র্যপীড়িত ও নৈঃসঙ্গ্যতাড়িত লেখক কায়েস আহমেদ গন্তব্যে পৌছুতে না পারার বেদনা বুকে নিয়ে জীবনের বিনাশ ঘটানোর মধ্য দিয়ে কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে যান স্বেচ্ছায়।

'বন্দী দুঃসময়' গল্পে সময়ের চাপে পিষ্ট মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামকে পানির বৃত্তের ভেতর গ্লাসবন্দি পিঁপড়ের বিচ্ছিন্নতা, অস্থিরতা ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। নৈঃসঙ্গ্যে বিপন্ন মেসের বাসিন্দা বাবলু গ্লাসবন্দি পিঁপড়ের অসহায়ত্ব দেখে প্রথমে উল্লাস ও উত্তেজনায় মেতে উঠলেও পরমুহূর্তেই নিদারুণ বিস্ময়ে সে লক্ষ করে, তার জীবনের করুণ বাস্তবতাই যেন বৃত্তবন্দি পিঁপড়ের জলে সাঁতার কাটার সমান্তরালে মঞ্চস্থ হচ্ছে। পিঁপড়েটার পানির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার আকুলতা বাবলুর অন্তর্লোককে নাড়িয়ে দেয়। পিঁপড়েটির বাঁচার এই শ্বাসরুদ্ধকর প্রচেষ্টার সাথে বাবলু এতটাই নিমগ্ন হয়ে যায় যে, রাস্তার অপর প্রান্তে ডাস্টবিনের পাশে নোংরা-ছেঁড়া-দুমড়ানো কাগজ বাতাসে উড়তে দেখে তার মনে হয় যেন একটা ডানা ভাঙা পাখি রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আত্মগত ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন বাবলুর মধ্যে তখন পরাবাস্তব কল্পনার সন্নিবেশ ঘটে :

> কোথা থেকে হলদে রঙের একটা কুকুর ডাষ্টবিনের পাশে পড়ে থাকা আবর্জনা শুঁকে শুঁকে পেছনের এক পা তুলে ডাষ্টবিনের গায়ে প্রস্রাব করে দিয়ে চলে গেলো। ডাস্টবিনের গায়ে তার সেই প্রস্রাবের আঁকাবাঁকা ধারার মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা একটা মানুষের এ্যাবষ্ট্রাক্ট ফর্ম ফুটে উঠেছে বলে মনে হলো তার। (কায়েস, ২০১৪ : ৩০)

বাবলুর মাথার ওর ফ্যান ঘুরলেও, কিচেনের উনুনের উত্তাপে সমস্ত রেস্টুরেন্ট উত্তপ্ত হয়ে যাওয়ায় প্রচণ্ড গরম লাগে তার। চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে রাস্তায় নামার পর তীব্র রোদের মধ্যেও কিছুটা শীতলতা অনুভব করে বাবলু। কিন্তু গতকাল সারারাত ঘুম না আসায় এখন সে মাথায় চিনচিনে ব্যথা অনুভব করে। বিচ্ছিন্ন মানুষ নিজেকে কোথাও সংযুক্ত করতে না পেরে অন্তর্গত অস্তিত্বের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে নিঃসঙ্গতা ও হতাশার পঙ্কে ডুবে যায়। তখন তার অস্তিত্ব হয়ে পড়ে বিপন্ন, ভেতরে জন্ম নেয় উদ্বেগ। আর উদ্বেগ যত বাড়ে, ব্যক্তি-অস্তিত্বের ভীতি ততই হুমকির মধ্যে পড়ে। ব্যক্তি-অস্তিত্বের প্রতি এই উদ্বেগ-ভীতিই জন্ম দেয় বিচ্ছিন্নতাবোধের। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকেই মানুষের মধ্যে নৈঃসঙ্গ্য ও পলায়নপর মনোবৃত্তির উদ্ভব ঘটে। তখন সে আর স্বাভাবিক জীবনের প্রতি আস্থা রাখতে পারে না। 'বন্দী দুঃসময়' গল্পের বাবলুর মধ্যেও আমরা তীব্র উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও নৈঃসঙ্গ্যের বিষয়টি লক্ষ করি। সামূহিক বিপন্নতায় অবসন্ন বাবলু রাত দুইটা-তিনটা পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করেও ঘুমাতে পারে না, অন্ধকারের ভেতর একটানা সিগারেট টানতে টানতে কখন অচেতন হয়ে যায় সে বুঝতেও পারে না। তারপর যখন মানুষের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, কাকের চেঁচামেচি, বালতি টানার শব্দ আর মসজিদে শিশুদের কোরাসে কোরআন পাঠের সমবেত চিৎকারে তার ঘুম ভাঙে, তখনও ক্লান্তিতে সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। ক্লান্তি তাকে অবসাদগ্রস্ত করে ফেলে। নিঃসঙ্গতার অসহনীয় যন্ত্রণায় কাতর বাবলুর কাছে সে মুহূর্তে উজ্জ্বলতা হারানো চাঁদকে না মাজা কাঁসার থালার মত মনে হয়, আর তখন :

> [...] তার ছোট নির্জন একাকী ঘরের জানালার উল্টো দিকে হাত কয়েক দূরের পাশের বাড়ির ঘরটিতে হঠাৎ করে আলো জ্বলে উঠেছিলো। তারপর দরোজা খোলার শব্দ, একজন বাইরে গেলো ফিরে এসে দরোজা লাগালো, বাতি নেভানোর শব্দ হলো, তারপর নারী কণ্ঠের চাপা স্বরে, 'না, না, দূর'— শুনতে পেলো, অতঃপর বিছানার ওপর শরীর পতনের শব্দে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। (কায়েস ২০১৪ : ৩২)

এই দৃশ্য অবলোকন করে বাবলুর চোখে ভেসে ওঠে মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের নানামাত্রিক সংকটের চিত্র। দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর পৈশাচিক তাণ্ডবে শ্মশান হয়ে যাওয়া দেশ, বন্যায় নষ্ট হওয়া ফসল, অভাব, মিল-কারখানার উপাদনহীনতা আর বেকার সমস্যার কথা চিন্তা করতে করতে আসন্ন সংকট থেকে বাঁচার একটি সম্ভাব্য সমাধানও বের করে ফেরে বাবলু। এই দুঃসময়ে শুধু পরিবার পরিকল্পনা করে নয়, স্বামী-স্ত্রীর যৌন-ক্রিয়া বন্ধ করে হলেও জনসংখ্যার বিস্তার রোধ করা অপরিহার্য বলে মনে হয় তার কাছে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভাই-বোন ভেবে হলেও রতিক্রিয়া বন্ধ রেখে জনসংখ্যা রোধ করার পরামর্শ দেয় সে। মেয়ের বিয়ের বিষয়ে দিন ধার্য করতে আসা এক প্রৌঢ়ের অপঘাত মৃত্যু দেখে বাবলুর অন্তর্বেদনার মাত্রা আরো বেড়ে যায়। লোকটির পরিবারের কথা ভাবতে ভাবতে বাবলুর হৃদয়ে রক্ষক্ষরণ হতে থাকে। সেই দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন।

> সে বিমূঢ় হয়ে যায়, মাত্র কয়েক মিনিট আগে যে লোক সুস্থ মানুষের মতো ব'সে ব'সে আলাপ করছিলো, এখন সে মরে পড়ে আছে। এই গ্রাম্য ষ্টেশনে লোকটা হয়তো কয়েক মাইল দূরে থেকে গাড়ী ধরতে এসেছিলো, একটু পরেই তার মৃতদেহ খাটিয়ায় করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, আসন্ন পারিবারিক দৃশ্যটি কল্পনা করতে করতে ভীষণ বিপন্ন হয়ে পড়তে থাকে ভেতরে ভেতরে। তার চোখে অজানা মেয়েটির মুখের আদল ভাসে। (কায়েস ২০১৪ : ৩৩-৩৪)

বিচ্ছিন্নতা-পীড়িত মানুষ নিঃসঙ্গতার দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের আশায় অনেক সময় অতীতের সুখ-স্মৃতির কথা মনে করে আনন্দ পায়। কুমিল্লা থেকে সুশান্ত যখন তার পাওনা টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছে, তখন কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে বাবলুকেও আমরা শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিচারণ করতে দেখি। আলো নিভিয়ে সবাই যখন শুড়ে পড়ে তখন সে মেসে ফিরে অন্ধকারের ভেতর কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে ঘরের ভেতর আলো জ্বেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। তখন—"ধীরে ধীরে বুকের ভেতর কুল কুল করে জলে ভরে যেতে থাকলে সে অভিভূতের মতো ডেকে ওঠে, 'বাবলু'" (কায়েস, ২০১৪ : ৩৭)। গল্পের শেষে গ্লাসবন্দি পিঁপড়েটার বাঁচার আকুতির স্বপ্ন দৃশ্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক বাবলুর নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত জীবনের সাদৃশ্যকে মিলিয়ে দেন।

'খঞ্জ রোদে শালিক ফড়িং' গল্পে কায়েস আহমেদ নিয়তিলাঞ্ছিত মানুষের নিগূঢ় জীবনজিজ্ঞাসার শৈল্পিক রূপায়ণে প্রকৃতির অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। রেল লাইনের ধারের একটি এলাকাকে কেন্দ্র করে গল্পের কাহিনি দানা বেঁধেছে। কত্‌বেল গাছের ছায়ায় নির্জীব পুটুলির মতো বসে থাকা লোকটিকে কেন্দ্র করেই গল্পের ভেতরকার কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। অন্যদিকে একটা ঢ্যাঙা ছোকরা দরজা খোলা মালগাড়িতে পা ঝুলিয়ে আখ চিবোতে চিবোতে কারো জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। মালগাড়িতে বসে ছোকরা ছেলেটি লক্ষ করে প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য কিংবা মানুষের আনাগোনা কোনো কিছুর প্রতিই তার কোনো খেয়াল নেই। লোকটিকে তখন তার পাগল বলে মনে হয়। অথচ কত্‌বেল গাছের তলায় বসে স্টেশনটাকে দেখলে মনে হয়—"লাল-হলুদ পেন্সিলে আঁকা ছোট্ট একখানা পেন্সিলের মতন" (কায়েস, ২০১৪ : ৩৮)। রেল স্টেশনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষের আলাপচারিতায় উঠে আসে দেশের চলমান

সংকটের কথা। তাদের একজন অভিমত দেয়, শান্তি আর ফিরে আসবে না। শান্তি ফিরে না আসার বেদনা তাদের চোখে-মুখে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। এই অস্থির সময়ের অবসান চায় তারা। কিন্তু কত্‌বেল তলায় বসে থাকা লোকটা এসবের কিছুই চেয়ে দেখে না। একটা অনিশ্চিত ভাবনা লোকটাকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে যেন। সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই লোকটা নির্জীব পুটুলির মতো বসে আছে কত্‌বেল গাছের তলায়। ঢ্যাঙা ছেলেটা তখন তাকে অপেক্ষায় বসিয়ে রাখা মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে গালি পাড়ে। প্রচণ্ড ক্ষুধায় ছেলেটার পেট মোচড় দিয়ে ওঠে। তখন সে চোখ বন্ধ করে ভাত আর তরকারির গন্ধ নিতে চায়। ছেলেটা কয়লার চাঙের পাশে গামছা বিছিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে। আর তখন ছেলেটার মধ্যে একট অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটে—

> কাত হয়ে শুয়ে দেখতে দেখতে মনে হয় সে অনেক ওপরে, আকাশ থেকে যেনো পৃথিবীকে দেখছে, গাছপালা, ঘাস-মাটি নিয়ে তার চেনা পৃথিবীটা ধীরে ধীরে ভারী অদ্ভুতভাবে প্রতিভাত হচ্ছে এখন। মনে হচ্ছে, সব কিছুই যেনো রোদের ভেতর গলে গলে পড়ছে, গলে গলে পড়ছে [...] (কায়েস, ২০১৪ : ৩৯)

এরই মধ্যে পরবর্তী ট্রেনে উঠার জন্য স্টেশনে লোকের জমায়েত বাড়তে থাকে। তখন ট্রেনের জন্য অপেক্ষমাণ এক যাত্রীর জবানীতে লেখক জানিয়ে দেন খাদ্যের চিন্তায় অস্থির মানুষের চরম হতাশার কথা, —"খবর জানেন, লোকজন দু'টো ভাতের আশায় রুগী হবার জন্যে হাসপাতালে ভিড় করছে" (কায়েস ২০১৪ : ৩৯)। অন্যজনের কথায় আরো হতাশ হতে হয় আমাদের, —"হ্যাঁ আজকের কাগজে আছে, মানুষ ঘাস সেদ্ধ খাচ্ছে। কি করে যে বাঁচবে মানুষ" (কায়েস, ২০১৪ : ৩৯)? ঢ্যাঙা ছেলেটা মেয়েটির সঙ্গে দেখা করবে বলে আজ রশি কলের কাজে যায়নি, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ অর্জিত হয়নি বলে রোজের মার যাওয়া টাকা ও সংসারের সমস্যার কথা ভেবে তার মধ্যে এক ধরনের অপরাধবোধ কাজ করতে থাকে। এই সব ভাবতে ভাবতে সে যখন :

> কয়লার চাঙটা মাথায় নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। কিছু দূর গিয়ে গিয়ে দেখতে পায়, বেগুনি রঙের আধ-ময়লা ডুরে শাড়িপরা বছর চৌদ্দ বয়সের লম্বা মেয়েটা কাঁকালে ঝুড়ি নিয়ে অন্যান্য প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ ক'জন ছেলেমেয়ের পেছনে পেছনে রেল সড়কের ওপর দিয়ে এদিকে আসছে। (কায়েস, ২০৪ : ৩৯)

মেয়েটিকে দেখে ঢ্যাঙা ছেলেটির তখন চোখ জ্বলতে থাকে। ডুরে শাড়ি পরিহিত মেয়েটিকে দেখার পরপরই তার পেটের ক্ষিধেটা মরে গিয়ে, রক্তের ভেতরে একটা ঝাঁ ঝাঁ করা অনুভূতির ঘুরপাক টের পায়। সে মেয়েটিকে বোরেজের দিকে যাবার জন্য ইশারা করে। ঢ্যাঙা ছেলেটি যখন মেয়েটির সঙ্গে রতিক্রিয়ায় ব্যস্ত তখন :

> নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায় মেয়েটার। এক সময় মনে হয়, ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে, আর সে সেই বৃষ্টির মধ্যে শুয়ে শুয়ে ভিজে যেতে যেতে প্রবল শব্দে মাটিতে কম্পন অনুভব করলে চমকে উঠে শুনতে পায় ঝড়ের বেগে একটা ট্রেন বেরিয়ে যাচ্ছে। (কায়েস, ২০১৪ : ৪০)

ঠিক সেই মুহূর্তে ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে একটা লোক মারা যায়, যার পূর্বাভাস গল্পের শুরু থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। ট্রেনে নিচে কাটা পড়ে মারা যাওয়া লোকটা সম্বন্ধে জনতার আদালতে অভিযোগ দায়ের করার মতো করে যখন একজন জানতে চায়, —"কিন্তু লোকটার এভাবে মরার কারণটা কি" (কায়েস, ২০১৪ : ৪০)? তখন কতবেল গাছের তলায় নির্জীব পুটুলির মতো বসে থাকা 'লোকটা'র কথা আমাদের মনে আসে। চরম হতাশা নিয়ে যে বসে ছিল

একাকী নির্জনে। গল্পের শুরু থেকেই লোকটার কোনো পরিচয় দেননি লেখক, তার কোনো বক্তব্যও নেই পুরো গল্পজুড়ে। লোকটা হয়ত কারো সাথে কথা না বলে, চারদিকের এই চরম বাস্তবতার মধ্যে নিজেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আত্মমুক্তির কোনো দিশা না পেয়ে, শেষে আত্মহননকেই আত্মমুক্তির পথ ভেবে বেঁচে থাকা মানুষগুলোকে অভিভূত করে দিয়ে আরো গভীর নির্জনতার পথে পাড়ি জমায় লোকটা।

'বিবমিষা' গল্পে বর্ণিত হয়েছে ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ রকিবের সাংসারিক দায়বদ্ধতার চাপে জীবনযুদ্ধে ধুকতে থাকা হতাশাপীড়িত নিঃসঙ্গ জীবনের ইতিবৃত্ত। বি.এস.সি পাশের পর দুই বছরের বেকার জীবনের ইতি ঘটিয়ে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরিতে যোগদান করে রকিব। কিন্তু এই চাকরি করে মানসিকভাবে স্বস্তিবোধ করে না রকিব। ওষুধের দোকানদারের কাছে ধর্না দিয়ে, কখনও খোশামোদ করে তাকে চাকরি বাঁচিয়ে রাখতে হয়। মাঝে মাঝে রকিবের নিজেকে ইনস্যুরেন্স কোম্পানির দালাল বলেও মনে হয়। আবার কখনও কখনও বিরক্ত হয়ে চাকরি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু সাংসারিক চাপ আর দুই বছরের বেকার জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে চাকরি ছেড়ে দেবার ইচ্ছাকে নস্যাৎ করে দেয়। তাই রকিবের মেজাজটা সবসময় খিঁচড়ে থাকে। রোদ, বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাকে কাজে যেতে হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে এক লক্ষ টাকার টার্গেট ফিল-আপ না করতে পারলে চাকরি বাঁচানো দায়। তাছাড়া দোকানের মালিকরা নানা অজুহাতে ওষুধ না রাখার ফন্দি আঁটে। তবুও তাকে বুকে কষ্ট নিয়ে মুখে হাসি ধরে রেখে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। রকিবের প্রতিদিনের কর্মক্লান্ত জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন :

> দুপুরের রোদ, ধুলোময় গরম হাওয়া, কপাল, মুখ, গলা এবং দুই হাতে ময়লা-চটচটে ঘাম, সারা শরীরের গা গুলিয়ে ওঠা ভ্যাপসা দুর্গন্ধময় ভাপ, চোখের ভেতর জ্বালা, মাথার ভেতর মৃদু ঝিমঝিমে ব্যথা এবং মন-মেজাজ খারাপ করে বসেও সে মনে মনে ছক কাটে, আগামীকাল সকালে নরসিংদী গিয়ে একটা ঢুঁ দিয়ে আসতে হবে। (কায়েস, ২০১৪ : ৪১-৪২)

একাকিত্ব ও নৈঃসঙ্গ্যবোধ রকিবকে বিকৃত ভাবনার দিকে ধাবিত করে। পরিবারের লোকজনের সঙ্গেও খুবই শিথিল সম্পর্ক তার। মা-বাবা, ছোট এক ভাই ও এক বোনের সংসারে কেবল সে-ই উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। বাবা ইউ.ডি অফিসের কেরানি ছিলেন। দুইবার স্ট্রোক করে ডান দিকের হাত ও পা প্যারালাইজড হয়ে বিছানায় একা একা পড়ে আছে। নিয়মিত তার ওষুধের প্রয়োজন হয়। বাবার সঙ্গে তার দেখা হয় কমই, ইচ্ছা করেই এড়িয়ে চলে অনেক সময়। কারণ বাবার যন্ত্রণাকাতর মুখচ্ছবি দেখে তার দম আটকে আসে, মাঝে মাঝে খুব রাগও হয় তার। বাবার জীবনের এই দুঃসহ পরিণতি রকিবকে বিয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। যখনই মা তাকে বিয়ের কথা বলে :

> মুখে পাত্তা না দিলেও ব্যাপারটাকে নাড়াচাড়া করে সে মনে মনে, কিন্তু স্ত্রী, সন্তান, সংসার ইত্যাকার বিষয়গুলো ভাবতে গেলেই কেনো যেনো তার বাবাকে মনে পড়ে: ভাঙাচোরা, ঘর্মাক্ত, চিন্তাক্লিষ্ট শৈশব কৈশোরের আব্বা, এবং এখন সারাদিন ঘরের ভেতর পড়ে পড়ে যে মানুষ থেকে থেকে ভাঙা ক্লান্ত গলায় হাঁকে, 'কৈ গো, কৈ গেলা'—তাকে দেখতে পায়। (কায়েস, ২০১৪ : ৪৭)

তাছাড়া সাংসারিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট, দিনভর খাটুনি, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার অচরিতার্থতাজনিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত তার মনের ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে তাকে বিচ্ছিন্নতাবোধের চরমে পৌঁছে দেয়। চাকরির প্রতি অসন্তুষ্টি তাকে ক্রমশই করে তোলে নিভৃতচারী ও অন্তর্মুখী। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবার সময় তার বিচ্ছিন্নতার রূপটি প্রবলভাবে ধরা পড়ে—

> রকিবের এখন কোন কথায় যোগ দিতে ভালো লাগছে না। ফেরীতে যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো, তেমনি ধরনের অনুভূতি আসছে এখন তার ভেতরে। যেনো অনেক দূর থেকে সে এই সব-মানুষ, কথা হাসি শুনছে বা দেখছে। (কায়েস, ২০১৪ : ৫০)

প্রতিদিনের কর্মব্যস্ত জীবনে তাকে গ্রাম-গঞ্জ-শহর-বন্দর সর্বত্র ঘুরপাক খেতে হয়। একদিন নরসিংদী তো পরের দিন টাঙ্গাইল আবার কখনোবা নবাবপুর, পাটুয়াটুলি, লক্ষ্মীবাজার, ইসলামপুর, বুলতা, গোলাকান্দা, পাঁচরুখী, বড়পা প্রভৃতি জায়গায় তাকে যেতে হয় চাকরি রক্ষার তাগিদে। তার এই নিঃসঙ্গ জীবনের অব্যক্ত যন্ত্রণা ক্রমে রূপ নেয় এক বিকৃত যৌন-বাসনায়। কর্মব্যস্ততার কারণে যেহেতু তার অবসরও মেলে কম। রাস্তায় চলাচলের সময় মেয়েদের দিকে তৃষ্ণার্ত চিত্তে তাকিয়ে থাকে সে। নৈঃসঙ্গ্যবোধ থেকে মুক্তি লাভের আশায় এক স্বপ্নময় আবেশে মতিঝিলে দেখা মেয়েটিকে নিয়ে গোসলখানায় যায়। রকিব মেয়েটির দিকে তাকালে মাথা নিচু করে সে দাঁড়িয়ে থাকে। রকিব মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলে তার দিকে একবার চোখ তুলে আবার মুখ নিচু করে ফেলে। ব্লাউজ ও শাড়ি খুলে যখন মেয়েটি রকিবের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন, —"নিরাবরণ মেয়েটির উপচে পড়া বুক, গভীর নাভি, বিশাল উরু, নিটোল বাহু, মেদহীন মসৃণ পেট, সরু কোমর, কোমরের দুপাশের ঢেউ খেলানো গভীর খাঁজ এক সঙ্গে জলমল করে ওঠে" (কায়েস, ২০১৪ : ৪৪)। কিন্তু রকিবের এই সুখ-সংসর্গ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। রকিব যখন দুবাহু দিয়ে প্রবলভাবে মেয়েটিকে কাছে টানতে যায় তখনই সব এলোমেলো হয়ে যায়। তার মাথার ভেতর তখন হু হু করে বাস ছুটতে থাকে।

'অন্ধ তীরন্দাজ' গল্পে কায়েস আহমেদ সমাজের অন্ধকার দিকগুলো আবিষ্কার করেছেন এবং সেই অন্ধকারের ওপর জ্যোৎস্নার আলো ফেলে জনসম্মুখে তা তুলে ধরেছেন। চারজন বিপথগামী যুবকের কাহিনি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে গল্পকার সমকালীন রাজনৈতিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক অসমতা ও সামাজিক বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট অসঙ্গতি ও বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। পেশাদার ভাড়াটে চার খুনি সগু, পচা, নিতাই এবং নাড়ু যখন বিজয় ঘড়ইকে খুন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন আকাশে ফিনফিনে জ্যোৎস্নার ঢেউ। কয়েকদিনের পচানে বৃষ্টির পর ইদানিং আবহাওয়া খুব চমৎকার যাচ্ছে। দিনের বেলার রোদ আর রাতের উচ্ছল হাওয়া এক অসাধারণ উপভোগ্য সময়ের জন্ম দিয়েছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, গাছের ডাল-পাতার ফাঁক দিয়ে গলে পড়া চাঁদের আলো, সুবিস্তৃত ধানের ক্ষেত, কুয়াশার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত আশ্বিনের বাতাস এক স্বর্গীয় আবহের সৃষ্টি করলেও, এসবের দিকে এই চার যুবকের কোনো মনোযোগ নেই। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বৈপরীত্য এদের ভেতরে চরম হতাশা, হাহাকার, যন্ত্রণা, বিকৃতি ও অবক্ষয়ের জন্ম দিয়েছে। এরা একত্রে থেকেও যেন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, অপরিচিত ও দূরবর্তী। মদ পান করে পটলার যুবতী বোনকে নিয়ে সগু যখন অশ্লীল কথা বলে বিকৃত সুখের আনন্দে মুখর, নাড়ু তখন পুকুরের পানিতে ভাসমান এক টুকরো দলামোচা কাগজের দিকে চেয়ে থেকে ভাবে :

> হাওয়া লেগে এক টুকরো জমাট জ্যোৎস্না যেনো একবার সামনে এগোয়, একবার পেছন হাঁটে। একবার বাঁ পাশ ফেরে, থির হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে কখনো, কখনো ডান পাশ ফিরে বোঁ বোঁ করে ক'পাক ঘুরে গিয়ে ফের সামনে এগিয়ে যায় হাঁসের মতো। তারপর পুকুরের তলা থেকে গুগলি তোলবার জন্যে ডুব দেয়। (কায়েস, ২০১৪ : ৫৫)

এই দৃশ্য দেখে নাড়ুর বহুদিন আগে মল্লিকদের পুকুর পাড়ে সাদা মুরগী ছানা গিলতে থাকা একটা প্রকাণ্ড চন্দ্রবোড়া সাপের কথা মনে পড়ে। এর মধ্য দিয়ে লেখক মূলত প্রতীকীভাবে নাড়ুর জীবনের চরম পরিণতির দিকটিই প্রস্ফুটিত করেছেন। যে বয়সে নাড়ুর হাতে বই

থাকার কথা ছিল, নষ্ট সমাজ তার হাতে তুলে দিয়েছে অস্ত্র। চার জনের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সী হাফপ্যান্ট পরা নাড়ু দেখতে অনেকটা মেয়েলী ধরনের। সগু নাড়ুর গায়ের কাছে ঘেঁষে কাঁধে হাত রাখে। তারপর ঘোলা চোখ আর গলায় ভাদ্রমাসের কুকুরের শব্দ নিয়ে সে যখন নাড়ুর গালে মুখ রাখে, তখন সে মদের গন্ধ পায়। এভাবে নাড়ুকে বারবার জ্বালাতন করার কারণে পচা সগুর ওপর রেগে গিয়ে বলে—"দ্যাক সগু' এ্যায়সা লাতি মারবো পোঁদে, শালার গাঁড়বাজারি ছুটিয়ে দেবো" (কায়েস, ২০১৪ : ৫৭)। পচার রাগের পেছনেও লুকিয়ে আছে অনেক দুঃখ, বঞ্চনা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। সে নিজের এবং পরিবারের কথা ভেবে অস্থির হয়ে যায়। জমি, চাকরি কিছুই নেই তার। বউ ছেলে নিয়ে উপোস থাকতে হয়। তিন জনের সঙ্গে থেকেও ভাবনায় যেন সে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কয়েখ মাস আগে পেটে ঘা হয়ে মরে যাওয়া মায়ের কথা মনে পড়ে তার। উপযুক্ত চিকিৎসা পেলে হয়ত সে তার মাকে বাঁচাতে পারতো কিন্তু যেখানে তারা পেটের খাবারই জোটাতে পারে না, সেখানে পেটের ঘায়ের চিকিৎসা করাবে কি দিয়ে? তাই টাকার বিনিময়ে বলাই মাইতির নির্দেশে বিজয় ঘড়ুইকে খুনের পরিবর্তে বলাই মাইতিকেই খুন করতে ইচ্ছা করে তার। সে তার আজকের এই পরিণতির জন্য বলাই মাইতিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। কেননা বলাই মাইতি সব টাকা অবৈধভাবে কামিয়েছে। আকালের সময় রাত দুপুরে লরি বোঝাই চাল পাচার করে সে অনেক টাকার মালিক বনেছে। এখন সে অঞ্চল প্রধান হবার জন্য এদেরকে টাকা দিয়ে ভাড়া করেছে পথের কাঁটা বিজয় ঘড়ুইকে হত্যা করার জন্য। অভাবের তাড়নায় অর্থলোভে তারা বিজয় ঘড়ুইকে হত্যা করতে রাজি হয়। বলাই মাইতির মতো লোকেরা সম্পদ লুট করে এদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটুকুও কেড়ে নিয়েছে। তিনবার চেষ্টা করেও বিজয় ঘড়ুইকে খুন করার পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ায় নিতাইয়ের কাছে চাঁদের আলোর উপস্থিতিকে হারামিপনা বলে মনে হয়। পচার চড় খেয়ে সগু ভেউ ভেউ করে কাঁদে। জীবনের প্রতি গভীর হতাশায় সগু নিজের মৃত্যু কামনা করে বলে; —"আমাকে মেরে ফেল আল্লার কসম, তোরা আমাকে এখানে খুন করে রেকে যা, আর বাঁচতে ভাল্লাগেনা, আমাকে মেরে ফেল পচা, তোর পায়ে পড়ি, আমায় [...]" (কায়েস, ২০১৪ : ৫৯)। সগুর নৈরাশ্য ও অসহায়ত্ব পচা, নাড়ু ও নিতাইকে যেন গ্রাস করে ফেলে। তাদের কাছে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকা সগুকে খুব বিশ্রী লাগে। "চাঁদের দিকে মুখ তুলে অবিকল একটা ঘোড়া চেঁচাচ্ছে যেনো। তবু পচা, নিতাই কিংবা নাড়ু কেউ কোন কথা বলতে পারে না। সমস্ত মাঠটা ওদের বুকের ভেতর ঢুকে যেতে থাকে।" (কায়েস, ২০১৪ : ৫৯)

চাঁদের আলোতে গল্পকার তাদের ভেতরের অসহায়ত্বকে তুরে ধরেন। একজন সমাজতাত্ত্বিকের মতো লেখক এই যুবকদের খুনী হবার প্রকৃত রহস্য যেমন উদ্‌ঘাটন করেছেন, তেমনি একজন মনস্তত্ত্ববিদের মতো তাদের নিরাশ্রয় জীবনের অন্তর্বেদনার অন্তহীন বিচ্ছিন্নতার কথাও তুলে ধরেছেন। সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য, আর্থিক অসাম্য ও বেকারত্বের কারণে কীভাবে যুবসমাজ ধ্বংসের দিকে চলে যায় গভীর সমাজদৃষ্টিসম্পন্ন লেখক কায়েস আহমেদ যুগ ও জীবনের সেই সংকটময় জটিলতাকে উপস্থাপন করেছেন 'অন্ধ তীরন্দাজ' গল্পে।

'সম্পর্ক' গল্পে কায়েস আহমেদ দীর্ঘ চার বছর পর দুই বন্ধুর পুনর্মিলনের মাধ্যমে তাদের ভেতরের অপ্রাপ্তি, বঞ্চনার ফলে সৃষ্ট অবসাদ-ক্লান্তি-বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। বাংলাদেশের একটি মফস্বল কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে জাফর অর্থনীতিতে অনার্স আর ইরফান বি.কম. শেষ করে। কলেজ জীবন থেকেই তাদের বন্ধুত্ব, সেও প্রায় পনেরো-ষোলো বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন তাদের বয়স ছত্রিশ ছুঁই ছুঁই। এদের একজন, জাফর চট্টগ্রামের একটি কলেজে আর ইরফান ঢাকায় একটি ব্যাংকের জুনিয়র

অফিসার হিসেবে চাকরি করে। এতদিন পর হঠাৎ ঢাকার তোপখানা রোডের ওপর দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ তাদেরকে করে তোলে স্মৃতিভারাতুর। এরপর তারা কাঁচ ঘেরা পরিচ্ছন্ন একটি নির্জন রেস্টুরেন্টে বসে আলাপে মেতে ওঠে। কাঁচের দরজা আঁটা পর্দায় ঘেরা এই রেস্টুরেন্টের ভেতরটা দুপুরের রোদের মধ্যেও শীতল থাকে। আর এই শীতলতার সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাউন্টারের কোন গোপন জায়গা থেকে সায়গল, হেমন্ত, সন্ধ্যা প্রমুখের গান শোনা যায়। এমন একটি মনোরম পরিবেশে বসে তারা আড্ডায় মেতে ওঠে। তাদের কথোপকথনের সূত্র ধরে জানা যায়, বছর ছয়েক আগে ইরফান বিয়ে করেছে। বউ, এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে তার সংসার। ইরফান বহুদিন পর ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে পেয়ে তার জীবনের ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা অনর্গল বলে যায়। ঢাকা শহরের মতো জায়গায় বাজার করে, বাড়ি ভাড়া দিয়ে বউ-বাচ্চা নিয়ে ঘর সংসার চালানো একজন চাকরিজীবীর পক্ষে যে কত কঠিন জাফরের কাছে ইরফান তার হিসেব করে সাংসারিক জীবনের কথা বলে যায়। এর মধ্যে স্ত্রীর বোকামির কারণে পুনরায় বাবা হতে যাওয়া ইরফানের মুখে দারুন দুচিন্তার ছায়া খেলা করে, তখন জাফরের বিয়ে না করাটা তার কাছে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয়। এরপর রাতে বাসায় ফিরে ইরফান তার স্ত্রী হেনার কাছে জাফর সম্পর্কে গল্প করে। সেই গল্পে জাফরের রাজনৈতিক জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনাও হেনার কাছে অবলীলায় বলে যায়। আর হেনা কিছুটা কৌতুক আর কিছুটা উত্তেজনা নিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বন্ধু সম্পর্কে গল্প করতে করতে মাথা ঝুঁকে আসে ইরফানের। তার চোখে-মুখে বিমর্ষতার ছায়া পড়ে। অন্যমনস্ক হয়ে যায় ইরফান। ক্রমে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইরফানের সঙ্গে দেখা হবার পর বাসায় ফেরার পথে জাফর তার নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত জীবনের কথা ভেবে অস্থির হয়ে যায়। আর বউ, বাচ্চা, সংসার থাকার পরেও অন্তর্লোকের শূন্যতা ও রিক্ততা ইরফানকে গ্রাস করে ফেলে। লেখক দুই বন্ধুর ভেতরের এই বিচ্ছিন্নতার চিত্র উপস্থাপন করেছেন এভাবে :

> বিয়ে, স্ত্রী, সন্তান ইত্যাকার বিষয়গুলো ভাবতে ভাবতে কোন দূর অতীতের সঙ্গে ক্রম-ক্ষয়িত বিচ্ছিন্নতা চিনচিন করতে থাকে সারা পথ। আবার এখন দেখো, এই ঘন গাঢ় গার্হস্থ্য পরিবেশে সন্তানের মাথায় হাত ভুলোতে ভুলোতে কোন গোপন ছিদ্রপথ দিয়ে উষ্ণ প্রস্রবণ হু হু করে শূন্যতা জলমগ্ন করে দেয়, এবং সেই টলটলে জলের ওপর শীতের বাতাসের মতো জাফর মৃদু মৃদু কাঁপে। (কায়েস, ২০১৪ : ৬২-৬৩)

ইরফান তার বন্ধু জাফরকে বাসায় দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসে। জাফরকে সে বিয়ে করাতে চায়, এমনকি স্ত্রী হেনার মাধ্যমে তার কাছে বিয়ের প্রসঙ্গটি তুললে লজ্জায় জাফরের মুখ লাল হয়ে যায়। তখন—"জাফরের মুখে স্পষ্ট কষ্টের রেখা দেখতে পায় হেনা, বোঝে খুব অস্বস্তিবোধ করেছে মানুষটা, তার কেমন মায়া হয়, রাগও ধরে" (কায়েস, ২০১৪ : ৬৬)। আহারাদি শেষ করে দুই বন্ধু যখন গল্প করছিল, তখন পর্দার ফাঁক দিয়ে হেনা জাফরের লোমশ হাতের একাংশ, কব্জিতে বাঁধা নীল ডায়েল আর ধীরোদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনে তার প্রেমে পড়ে যায়। বন্ধু চলে যাবার পর রাত এগারটার দিকে ইরফান বাতি নিভিয়ে যখন হেনার সঙ্গে গভীর সঙ্গমে লিপ্ত, তখন হেনার মুখে জাফরের প্রসঙ্গ উপস্থাপনের মাধ্যমে লেখক জাফরের প্রতি হেনার প্রেমের বিষয়টি প্রতীকীভাবে তুলে ধরেছেন। ইরফানের সঙ্গে গভীর মিলন মুহূর্তেও হেনার জাফর প্রসঙ্গ উত্থাপন তাদের মানসবিচ্ছিন্নতা ও যুগল-নিঃসঙ্গতার অভ্রান্ত স্মারক :

> আচ্ছা তোমার বন্ধু [...]

> হেনার আঠালো ধ্বনি ফুটে উঠতে না উঠতে ইরফান ভারী নিশ্বাসের সঙ্গে কাঁপা অস্থির কণ্ঠ ব'লে ওঠে, 'আহ, এখন না, পরে, পরে।'
>
> আর একজোড়া নিটোল, ঈষৎ লোমশ হাতের পুরুষ বেষ্টন হেনাকে বিপুর নীলাভ নক্ষত্র বীথির মধ্য দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলে এবং সেই অনন্ত শীতল নৈশব্দের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সে অনুভব করতে থাকে একটি বাদামী রঙের শরীর মোমের মতো গলে গলে তার ভেতর লীন হয়ে যাচ্ছে। (কায়েস, ২০১৪ : ৬৪)

ইরফানের বাসা থেকে দাওয়াত খেয়ে ফেরার পথে রাখালদার রেস্টুরেন্টে যায় জাফর, সেখান থেকে জুবিলি ট্যাংক। তারপর সত্য ভট্টাচার্যের বাড়ি যেতে যেতে সন্ধ্যা নেমে আসে। সত্যদের এক তলা বাড়ির উঠোনের এক কোণে শ্বেতবসনা এক বৃদ্ধা নারীর সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে গলবস্ত্র হয়ে প্রণামের দৃশ্য জাফরের ভেতরে বিচ্ছিন্নতা ও নৈঃসঙ্গ্যতার এক নতুন প্রান্ত উন্মোচন করে। একাকিত্বের ঘূর্ণিপাকে ঘুরতে থাকে জাফর। তারপর—"সন্ধ্যার অন্ধকারে কালো হয়ে আসা রমনা লেকের পাড়ে, শিরিষ গাছের নীচে, আলো আঁধারিতে জাফর দুহাতে মাথা চেপে সামনে ঝুঁকে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে" (কায়েস, ২০১৪ : ৬৭)। ত্রিমাত্রিক বিচ্ছিন্নতাবোধের সার্থক রূপায়ণে কায়েস আহমেদের 'সম্পর্ক' গল্পটি কৃতিত্বের দাবিদার।

'গন্তব্য' গল্পে চাকরিচ্যুত শামুর হতাশাগ্রস্ত জীবনের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁতের কারখানায় কাজ করতো শামু, কিন্তু সুতোর টানাটানির কারণে তাঁত কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে সুশীল সাঁতরা। তাই কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই হুট করে চাকরি চলে যায় শামুর। হঠাৎ চাকরি হারিয়ে শামুর মাথায় রাজ্যের দুশ্চিন্তা ভর করে। তার মনে হয়, কাপড় না বুনলে মানুষ কি মানপতা পরিধান করে থাকবে? কারখানা থেকে খালি হাতে ফেরা শামু চাকরির আশায় ইনুসের রঙের ভাঁটিতে চেষ্টা করেও চাকরি পায়নি কারণ সুতোর অভাবে তাদেরও দুর্দশা চলছে। এইসব ভাবতে ভাবতে শামু যখন বাড়ির দিকে ফিরছিল, তখন সে জাহানের দোকানের ভেতরে জুয়ার আসর বসানো মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পায়। জুয়ার আসরে থাকা অনেকের মধ্যে শামু বি.এ পাশ করা স্কুর মাস্টার কালামের ওপর ভীষণ রেগে যায়। কারণ স্কুল ছুটি হতে না হতে কালাম মাস্টার এসে এই জুয়ার আসরে উপস্থিত হয় আর রাত দশটা এগারটা পর্যন্ত জুয়ার আসরে অবস্থান করে। কালাম মাস্টারের এহেন কর্মকাণ্ডের সূত্র ধরে তৃতীয় ও প্রথম শ্রেণিতে পাঠরত দুই ছেলের কথা মনে হয় শামুর। ছেলেদের কথা ভাবতে ভাবতে শামুর ভেতরে চরম হতাশা কাজ করতে থাকে। এই গভীর সংকটমুহূর্তে শামু নিজের ভেতরেই হতে থাকে রক্তাক্ত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ। সে যেন নিজের থেকেই নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মাছের শূন্য ডালা নিয়ে আসা মেছুনিদের দেখে কৈ মাছ ভাজা আর ঘন করে রান্না করা ডালের সাথে ভাপ ওঠা থালা ভর্তি ভাতের কথা মনে পড়ে তার। তখন প্রচণ্ড ক্ষুধা অনুভব করে শামু। কিন্তু সে পার্থক্য করতে পারে না—"মাছ ভাজা, ডাল আর ভাতের কথা আগে মনে পড়লো, না ক্ষিদে তার আগে থেকেই পাচ্ছিলো ঠিক করতে পারে না" (কায়েস, ২০১৪ : ৭০)। ডুরে শাড়ি পরিহিত তেরো বছরের একটা মেয়েকে দেখে শামুর কালো, দাঁত উঁচু, চ্যাপ্টা নাক, মোটা ঠোঁট আর প্যাঁকাটির মতো সরু বউয়ের কথা মনে পড়ে। হতাশার দুর্ভর বেদনায় বিপন্ন শামুর তখন মনে হয় :

> শালার দুনিয়ার যত ভালো ভালো মেয়ে মানুষ সব অন্য লোকের দখলে।—তার সঙ্গে চাকরিহীন ভবিষ্যৎ, রেল লাইনে কাটা পড়া ঘেঁটু মালের ছেলে, ওয়াগন ভাঙা সগুদের দলে ভিড়বে কিনা—এইসব মারমুখী ভাবনা পাওনাদার কাবলীর মতো 'সালে হারামখো'র বলে লাঠি উচিয়ে তেড়ে আসতে থাকলে উঠে পড়ে সে। (কায়েস, ২০১৪ : ৭১)

চাকরিহীন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ-ভাবনায় উদ্বিগ্ন শামুর বেঁচে থাকার প্রতিই অরুচি ধরে যায়। বেঁচে থাকার দুর্বহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে মৃত্যুচিন্তাও আসে তার মধ্যে। আর একথা ভাবতে গেলেই সহায়সম্বলহীন পরিবারের চিত্র তার চোখে ভেসে ওঠে। চাষের মতো এক ছটাক জমি নেই তার, ইঁদুরের গর্তের মতো একখানা মাটির ঘর—তাও আবার মেরামতের অভাবে ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে। চাকরি নেই শুনে স্ত্রী আয়াতনের মেজাজ বিগড়ে যাবার কথা চিন্তা করে শামু মল্লিকদের বাঁশ-ঝাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে কোমর থেকে গামছা খুলে বাতাস দেয়া শুরু করলে একটু স্বস্তিবোধ করে। বাগানের গেট পেরিয়ে একটি পুকুর দেখতে পায়, তার নেয়াপাতি ডাবের মতো টলটলে জল শামুর মনে স্নানের ইচ্ছা জাগায়। স্নানের উদ্দেশ্যে সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় বাগানের ভেতর কাঁঠাল গাছের পাতা নড়াচড়া দেখে থমকে দাঁড়ায় শামু। এক আদিম হিংস্র উন্মত্ত ভাবনা পেয়ে বসে তাকে। ওনো হাড়ির বিধবা মেয়ে কামিনীকে দেখে শামুর ভেতরে লালসার এক বিষবৃক্ষ পত্র পল্লবিত হতে থাকে—"মাথার ভেতর কোন গোপন ঝাঁপি থেকে কুণ্ডলী পাকানো সাপটা মুহূর্তে ফণা ধরে দাঁড়িয়ে যায় শামুর। নাক দিয়ে সাপের জিভের মতো নিঃশ্বাস আসা-যাওয়া করে" (কায়েস, ২০১৪ : ৭২)। শামু কামিনীকে ধর্ষণরত অবস্থায় মুখে থু থু ছিটিয়ে হত্যা করে। শামু যখন বুঝতে পারে কামিনী মরে গেছে, তখন তার চারপাশের পৃথিবী মাথার ভেতর থরথর কেঁপে ওঠে দপ করে নিভে যায়। লেখক শামুর আত্মবিচ্ছিন্ন ভাবনার শব্দরূপ দিয়েছেন এভাবে :

> শামুর দুই পা মাটিতে বসে যেতে থাকে। ডান পায়ের ওপর ভর দিয়ে বাঁ পা তুলতে গেলে ডান পায়ের পাতা, গোঁড়ালি, গোলি থেকে উর্ধ্বাংশ পেরিয়ে হাঁটু পর্যন্ত পুঁতে গেলে সে হাঁসফাস করতে করতে বাঁ পায়ের ওপর ভর দিয়ে ডান পা তুলতে যায়, জুলাই মাসের খটখটে মাটিতে তার বাঁ পা ভসভস করে পুঁতে যেতে যেতে হাঁটু পর্যন্ত এসে ঠেকলে দম বন্ধ হয়ে আসে। (কায়েস, ২০১৪ : ৭৪)

মাথার ভেতরে অবিরাম বুটের শব্দ আর বুকের ভেতরে মাকু চলার আওয়াজে শামু এতটাই বিপন্ন হয়ে পড়ে যে সে নিজের পায়ের শব্দ শুনে নিজেই চমকে ওঠে। সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন শামু অপ্রকাশ্য মর্ম-যাতনা নিয়ে অতলান্তিক নিঃসঙ্গতায় তলিয়ে যেতে থাকে।

অন্ধ তীরন্দাজ গল্পগ্রন্থে কায়েস আহমেদ বিরুদ্ধ ও বিপর্যস্ত যুগ-পরিবেশে বসবাসকারী মানুষের ক্লেদ, ক্লান্তি, অবক্ষয়, হতাশা, নৈরাশ্য, বিচ্ছিন্নতা, বিষণ্ণতা ও নিঃসঙ্গতার চিত্র উপস্থাপনে প্রাতিস্বিক শিল্পভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিরূপ সময় ও সমাজের চাপে পিষ্ট বিপন্ন-উন্মূলিত মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধের স্বরূপ উন্মোচনে *অন্ধ তীরন্দাজ* হয়ে উঠেছে লেখকের অন্তর্গত জীবনজিজ্ঞাসা ও সত্তাসন্ধানেরও চিত্রলিপি।

সহায়কপঞ্জি

অনিরুদ্ধ কাহালি (২০১৮)। 'কায়েস আহমেদের গল্প', চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত *গল্পকথা*, ৮ম বর্ষ ৯ম ও ১০ম সংখ্যা।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (২০০২)। *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*। সপ্তম মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আজহার ইসলাম (২০১৪)। *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*। প্রথম প্রকাশ, অনন্যা, ঢাকা।

আলী রিয়াজ (২০১২)। 'কায়েস আহমেদের ছোটগল্প অতঃপর কথাসাহিত্যের স্বরূপ', শওকত হোসেন ও শরমিন নিশাত সম্পাদিত *হালখাতা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা।

কায়েস আহমেদ (২০১৪)। *কায়েস আহমেদ সমগ্র*। তৃতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
চঞ্চল কুমার বোস (২০০৯)। *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*। প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৭)। *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*। প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
শওকত আলী (১৯৯৪)। 'কায়েস আহমেদ ও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা', সুশান্ত মজুমদার সম্পাদিত *কায়েস আহমেদ : নিরাবেগ বোঝাপড়*। প্রথম প্রকাশ, সন্দেশ, ঢাকা।
হায়াৎ মামুদ (১৯৯৪)। 'চক্ষুষ্মান তীরন্দাজ', সুশান্ত মজুমদার সম্পাদিত *কায়েস আহমেদ : নিরাবেগ বোঝাপড়া*। প্রথম প্রকাশ, সন্দেশ, ঢাকা।